بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে, যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত, স্নেহশীল ও দয়ালু নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২২ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকাল জামাতে মুসলেহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে জলসা হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে, যাতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তিনি এই পুত্রকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক করবেন। তিনি ধর্মের সেবক হবেন, দীর্ঘজীবন লাভ করবেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এটি ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারির ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি ঐশী সমর্থন এবং তাঁর সত্যতার অনেক বড় একটি নিদর্শন। অতএব এই সন্তানের জন্মের যে সময়কাল দেয়া হয়েছিল, সে অনুসারে এ সন্তান ১৮৮৯ সনের ১২ জানুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করে,যার নাম রাখা হয়েছে মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ। তাকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের ইন্তেকালের পর খিলাফতের পোশাক পরিধান করান। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর জীবনের কিছু ঘটনা এবং তিনিই যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল- এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। কিন্তু তার পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা তাঁরই ভাষায় উপস্থাপন করছি। এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল এক পুত্রের জন্ম সম্পর্কে নয়, বরং এমন এক মহান পুত্রের জন্ম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যার আগমনের মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ভিত রচিত হওয়ার ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের যে উত্তর দিয়েছেন তা উপস্থাপন করছি, আমি যেমনটি বলেছি, এটি তার নিজের ভাষায় এবং পড়ার মতো একটি বিষয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখানে চোখ মেলে দেখা উচিত যে, এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে, যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত, স্নেহশীল ও দয়ালু নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন এক মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শত গুণ উন্নত, মহান, শ্রেষ্ঠ, অধিক উত্তম ও অধিক সম্পূর্ণ, কেননা মৃতকে জীবিত করার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করে একটি আত্মাকে ফিরিয়ে আনা। এখানে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এবং হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর কল্যাণে এই অধমের দোয়া কবুল করে এমন কল্যাণময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

হুজুর (আই.) বলেন, সুতরাং কোন সাধারণ রূহ এর জন্য দোয়া করা হয় নি। বরং একটি নিদর্শন চাওয়া হয়েছে। যার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বহু গুণাবলীর আধার এক পুত্রের সুসংবাদ দান করেছেন। এমন মহান সন্তানের সংবাদ দিয়েছেন যিনি দীর্ঘজীবি হবেন, অত্যন্ত মেধাবী আর বুদ্ধিমান হবেন, ঐশ্বর্যশালী ও মাহাত্ম্যের অধিকারী হবেন, জাতিসমূহ তার মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে, তাকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হবে, কালামুল্লাহ্ অর্থাৎ কুরআনের সুগভীর জ্ঞান তাকে দান করা হবে, আর সেই খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি কুরআন সেবার এমন মহান সৌভাগ্য লাভ করবেন যে, আল্লাহ্র বাণীর মর্যাদা পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হবে। তিনি বন্দিদের মুক্তির কারণ হবেন। তিনি 'আলমে কাবাব' হবেন, অর্থাৎ তার যুগে এমন আন্তর্জাতিক ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে যা সারা পৃথিবীকে কয়লায় রূপান্তরিত করবে। তিনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবেন।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, তার শিক্ষাদীক্ষার সাথে যতটুকু সম্পর্ক আছে, কুরআন নাযেরা পড়ার পর রীতিমত স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রচলিত শিক্ষা অর্জনের তার সুযোগ হয়েছে। আর তারও চিত্র হলো, ঘরে তিনি শিক্ষকদের কাছে উর্দূ ও ইংরেজীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর নিজের ভাষাতেই শুনি। তিনি লিখেন, আমার "শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী হলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। তিনি যেহেতু হাকীমও ছিলেন, তাই তিনি জানতেন যে, আমার স্বাস্থ্য এমন নয় যে, আমি বেশিক্ষণ বইয়ের ওপর চোখ রাখতে পারব। এ কারণে তার রীতি ছিল, তিনি আমাকে নিজের কাছে বসিয়ে নিতেন আর বলতেন, মিয়া! আমি পড়ছি, তুমি শুনতে থাক। এর কারণ ছিল শৈশবে আমি চোখের ট্রাকোমায় আক্রান্ত ছিলাম। অর্থাৎ চোখের রোগ ছিল, আর লাগাতার তিন-চার বছর পর্যন্ত আমার চোখে ব্যথা হতে থাকে। চোখে এত ভয়াবহ কষ্ট দেখা দেয় যে, ডাক্তাররা ঘোষণা দেয়, এর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবে। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকেন আর একইসাথে রোযা রাখাও আরম্ভ করেন। তিনি (রা.) বলেন, এখন আমার মনে নেই তিনি (আ.) কয়টি রোযা রেখেছিলেন। যাহোক তিনি ৩ থেকে ৭টি রোযা রেখে থাকবেন। যখন তিনি শেষ রোযার ইফতারি করতে যাচ্ছিলেন আর রোযা

খোলার জন্য কোন কিছু মুখে নিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আমি চোখ খুলি আর বলে উঠি যে, আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই রোগের প্রবলতা এবং এর লাগাতার হামলার ফলে আমার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, যার ফলশ্রুতিতে আমার বামচোখে কোন দৃষ্টিশক্তি নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার শিক্ষকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পড়ালেখা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। সে যতটা পড়তে চায় পড়বে, তার ওপর যেন চাপ প্রয়োগ করা না হয়, কেননা তার স্বাস্থ্য পড়ালেখার চাপ সহ্য করার শক্তি রাখে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাকে শুধু এটিই বলতেন যে, তুমি কুরআনের অনুবাদ এবং বুখারী হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে পড়ে নাও, অর্থাৎ মওলানা নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালে (রা.)-এর কাছে। এছাড়া তিনি আমাকে এটিও বলেছিলেন যে, কিছুটা তিব্ব বা চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়ে নিও, কেননা এটি আমাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য।

তিনি বলেন, মাষ্টার ফকিরুল্লাহ্ সাহেব আমাদের স্কুলে গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ছেলেদের বোঝানোর জন্য তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে তা আমি দেখতে পেতাম না, কেননা বোর্ড পর্যন্ত আমার দৃষ্টি পৌঁছত না। এছাড়া এমনিতেও আমি বোর্ডের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারতাম না, কেননা চোখ অবষণ্ন হয়ে পড়তো। এ কারণে আমি ক্লাসে বসা বৃথা কাজ মনে করতাম। তাই কখনো ইচ্ছা হলে যেতাম, আর কখনো যেতাম না। মাষ্টার ফকিরুল্লাহ্ সাহেব একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, হুযূর! সে কিছুই পড়ে না। কখনো ইচ্ছা হলে মাদ্রাসায় আসে আবার কখনো আসে না। তিনি (রা.) লিখেন, আমার মনে আছে যে, মাষ্টার সাহেব যখন মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে এই অভিযোগ করেন তখন আমি এই ভয়ে পালিয়ে যাই যে, জানা নেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এখন কী পরিমাণ অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু এ কথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মাষ্টার সাহেবকে বলেন, এটি আপনার বড় অনুগ্রহ যে, আপনি শিশুদের বিষয়ে যত্নবান, আপনার কথায় আমি আনন্দিত হয়েছি যে, সে কখনো কখনো মাদ্রাসায় যায়। অর্থাৎ এটি খুব ভালো কথা যে, সে কখনো কখনো মাদ্রাসায় যায়। নতুবা আমার মতে তার স্বাস্থ্য পড়াশোনা করার মতো নয়। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুচকি হেসে বলেন যে, আমরা কি তাকে দিয়ে চাল-ডালের ব্যবসা করাব যে, তাকে হিসাব শিখাতে হবে। সে গণিত পারুক বা না পারুক, তাতে কোন অসুবিধা নেই। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা কি কোন গণিত শিখেছিলেন? সে যদি মাদ্রাসায় যায় তাহলে ভালো কথা, নতুবা তাকে বাধ্য করা উচিত নয়। এ কথা শুনে মাষ্টার সাহেব ফিরে যান, আর আমি আরো বেশি এই নমনীয়তার সুযোগ নিতে থাকি এবং এরপর মাদ্রাসায় যাওয়াই ছেড়ে দিই। কখনো কখনো মাসে কেবল দু'একবার যেতাম। মোটকথা এভাবেই আমি লেখাপড়া করেছি। আর বাস্তবিকপক্ষে আমি বাধ্যও ছিলাম, কেননা শৈশবে চোখের কষ্টের পাশাপাশি আমি যকৃতের রোগেও আক্রান্ত ছিলাম। যকৃতের চিকিৎসার জন্য অনবরত ছয় মাস আমাকে মুগডাল বা শাকের পানি খাওয়ানো হতো। একইসাথে প্লীহাও বড় হয়ে যায়। আর প্লীহার ওপর রেড আয়োডাইড অফ মার্কারি মালিশ করা হতো। অনুরূপভাবে গলাতেও তা মালিশ করা হতো, কেননা আমার গলগণ্ড রোগ অর্থাৎ টনসিলের কষ্ট ছিল। বস্তুত চোখের ট্রাকোমা, যকৃতের রোগ, প্লীহার কষ্ট, একইসাথে জ্বর আরম্ভ হওয়া, যা অনেক সময় ছয় মাস পর্যন্ত নামতো না, আর আমার পড়ালেখা সম্পর্কে বুযুর্গদের এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া যে, সে যতটা পড়তে চায় পড়ুক, তার ওপর যেন চাপ প্রয়োগ করা না হয়- এ অবস্থায় সবাই অনুমান করতে পারে যে, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার অবস্থা কেমন হবে।

হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) আমাকে সবসময় বলতেন যে, মিয়া! তোমার স্বাস্থ্য এমন নয় যে, তুমি নিজে পড়তে পারবে। তাই আমার কাছে চলে এসো, আমি পড়বো আর তুমি শুনতে থেকো। অতএব তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রথমে কুরআন পড়ান, এরপর বুখারী পড়িয়ে দেন। আর এমন নয় যে, তিনি আমাকে ধীরে ধীরে কুরআন পড়িয়েছেন, বরং তার পড়ানোর রীতি ছিল তিনি কুরআন পড়ে সাথে সাথে অনুবাদ পড়তেন, আর কোন কিছু প্রয়োজনীয় মনে করলে তা বলে দিতেন, নতুবা দ্রুততার সাথে পড়তে থাকতেন। তিনি তিন মাসে আমাকে পুরো কুরআন পড়িয়ে দেন। আমি তার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়ি পড়েছি আর কুরআনের তফসীরও পড়েছি। কুরআনের তফসীর তিনি দুই মাসে পড়িয়ে শেষ করেন। তিনি আমাকে তার কাছে বসিয়ে নিতেন আর কখনো অর্ধেক এবং কখনো পুরো পারা অনুবাদসহ শুনাতেন। কোন কোন আয়াতের তফসীরও করতেন। একবার রমজান মাসে তিনি পুরো কুরআনের দরস প্রদান করেন। তাতেও আমি অংশগ্রহণ করি। কয়েকটি আরবী পুস্তিকাও তার কাছে পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। বস্তুত এই ছিল আমার মোট পড়াশোনা। যখন আমি এই কোর্স শেষ করছিলাম, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা ছিল জ্ঞানের জগতে তার বুৎপত্তি সংক্রান্ত।

হুজুর (আই.) বলেন, অতএব এ ছিল তার জ্ঞানগত অবস্থা বা কিভাবে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন তার চিত্র। কিন্তু তার বক্তৃতা, ভাষণ, রচনাবলী আর কুরআনের তফসীর এই কথার সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে পড়িয়েছেন। নিশ্চয় এটি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জীবদ্দশায় ১৯০৬ সনে যে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে তিনি প্রথমবার জনসমক্ষে বক্তৃতা করেন। হযরত কাজী মুহাম্মদ যহুর উদ্দীন আকমল সাহেব বলেন, নবুয়্যতরূপী সৌরজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং রিসালতের জগতের উজ্জ্বল রত্ন স্নেহভাজন মাহমুদ, আল্লাহ্ তার নিরাপত্তা বিধান করুন, শিরক সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য মঞ্চে দণ্ডায়মান হয়। আমি বিশেষ মনোযোগের সাথে তার বক্তৃতা শুনতে থাকি। কী বলব, বাগ্মিতার এক বন্যা ছিল যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। সত্যিই এত ছোট বয়সে চিন্তাধারার এমন পরিপক্কতা নিদর্শনের চেয়ে কম নয়। আমার মতে এটিও হুযূর (আ.) এর সত্যতারই একটি নিদর্শন। এটি থেকে বোঝা যায় যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) এর তরবীয়তের প্রভাব কোন্ পরাকাষ্ঠায় উপনীত ছিল।

সেযুগে তার ধর্মীয় কর্মব্যস্ততা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, আর মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা বলছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য **"সে দ্রুত বড় হবে"** এর তিনিই সত্যায়নস্থল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও ধর্মের জন্য তার এই উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা অনুভব করেছেন। যেমন একবার

তিনি বলেন, মিয়া মাহ্মুদের মাঝে এতটা ধর্মীয় উদ্দীপনা ও উচ্ছাস বিদ্যমান যে, আমি অনেক সময় তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করি।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) তার যে জীবনি লিখেছেন তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেন, প্রথম খিলাফতের প্রারম্ভে হযরত সাহেবযাদা সাহেবের বয়স ছিল ১৯ বছর আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের তিরোধানের সময় তিনি তার বয়সের ২৬ তম বছরে পদার্পন করেন। এই অল্প বয়সে তার রচনা ও বক্তৃতার যে ধরন ও বৈশিষ্ট্য ছিল- তার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। "তার ধ্যানধারণা এবং চিন্তাধারার মাঝে একজন অভিজ্ঞ চিন্তাবিদের পরিপক্কতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তার কথা প্রভাব বিস্তার ও আবেদন সৃষ্টি আর নিষ্ঠা ও আত্মবিলীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। কৃত্রিমতা কাকে বলে তা তার উক্তি জানতো না। আর লেখা ছিল ভণিতামুক্ত। বক্তৃতায় এক সহজাত সাবলীলতা ছিল এবং রচনা ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন স্রোতস্বিনীর মতো। উভয়টি কুরআনের জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের পানিতে সমৃদ্ধ ছিলআর অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর ১৯ বছর বয়সে তিনি যে প্রথম বক্তৃতা করেছেন, সেটি সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এক বুযুর্গ হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে,

আরেকটি ঘটনার কথা আমি এ প্রবন্ধে উল্লেখ করতে চাই, আর তাহলো- হুযূর (রা.) এর প্রথম বক্তৃতা, যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ইন্তেকালের পর প্রথম জলসা সালানায় প্রদান করেছেন। মৌলভী সাহেব তখনো জীবিত ছিলেন। এই জলসা মাদ্রাসা আহমদীয়ার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মঞ্চে হুযূরের ডান পাশে শোভা পাচ্ছিলেন। আরমঞ্চটিছিলউত্তরমুখী। মৌলভী শের আলী সাহেব বলেন, এই বক্তৃতা সম্পর্কে দুটো কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, তখন তার কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গি, তার উচ্চারণ এবং বক্তৃতার রীতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কণ্ঠস্বর এবং বক্তৃতার রীতি-পদ্ধতির সাথে এত গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যে, শ্রোতাদের হৃদয়পটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর স্মৃতি জাগ্রত হয়, যিনি মাত্র স্বল্পকাল পূর্বেই আমাদের ছেড়ে গেছেন। শ্রোতাদের অনেকেই এমন ছিল যাদের চোখ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর এই কণ্ঠস্বর শুনে অশ্রুধারা নেমে আসে, যা তখন তাঁর প্রতিশ্রুত পুত্রের মুখ থেকে সেভাবে আসছিল যেভাবে এক অদৃশ্য ব্যক্তির আওয়ায গ্রামোফোনের মাধ্যমে পৌঁছে থাকে। সেই অশ্রু বিসর্জনকারীদের মাঝে একজন এই অধমও ছিল। যদি এই কথা বলা সঠিক হয় যে, মানুষের রূহ অন্যের ওপর অবতরণ করে থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আত্মা তার ওপর নাযেল হচ্ছিল। আর এই ঘোষণা দিচ্ছিল যে, এই হলো আমার প্রিয় পুত্র, যাকে রহমতের নিদর্শন স্বরূপ দান করা হয়েছে। আর যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, সে সৌন্দর্য ও পুণ্যকর্মে তোমার নযীর বা দৃষ্টান্ত হবে। এই বক্তৃতা সম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কথা হলো, বক্তৃতার সমাপান্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), যার সারাটি জীবন কুরআন সম্পর্কে প্রণিধানে অতিবাহিত হয়েছে এবং যার আত্মার খোরাক ছিল কুরআন, তিনি বলেন, মিয়া সাহেব অনেক আয়াতের এমন তফসীর করেছেন যা আমার জন্যও নতুন ছিল। মৌলভী সাহেব লিখেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর এটি তার প্রথম বক্তৃতা ছিল যা তিনি জামা'তের সামনে করেছেন। আর এই প্রথম বক্তৃতায় কুরআন শরীফের এমন তত্ত্বজ্ঞান তিনি বর্ণনা করেছেন যা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর মতো কুরআনের আলেমও স্বীকার করেছেন যে, এগুলো তার জন্যও নতুন। অতএব এই তত্ত্বজ্ঞান সেই যুবককে কে শিখিয়েছে, এই প্রজ্ঞা আর এই জ্ঞান যৌবনের সেই দিনগুলোতে তাকে কে দিয়েছে। তিনিই যিনি কুরআন শরীফে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলেছেন, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ আর সে যখন তার পরিপক্কতার বয়সে উপনীত হলো তখন আমরা তাকে বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। মৌলানা শের আলী সাহেব বলেন, তিনি শুধু সাধারণভাবেপ্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পর্কেইকথা বলেন নি বরং কুরআনের অভূতপূর্ব তত্ত্বজ্ঞান তুলে ধরেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন সম্পর্কে বলেন, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ যাদের পবিত্র করা হয়েছে তারা ব্যতীত এটিকে আর কেউ স্পর্শও করতে পারে না। তিনি বলেন, কৈশোরের নির্জন দিনগুলো পার হতেই কুরআন শরীফের এমন নতুন ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান মানুষের সামনে বর্ণনা করা এ কথার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি তার শৈশব আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত করেছেন। আর তিনি শৈশবেই পবিত্রদের জামা'তভুক্ত ছিলেন।

শৈশবেই তার ইবাদতের চিত্র কেমন ছিল এ সম্পর্কে হযরত শেখ গোলাম আহমদ ওয়ায়েজ সাহেবের হৃদয়েও জাগ্রত হয়েছে, যিনি একজন নবমুসলিম ছিলেনআর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিষ্ঠা ও ঈমানের ক্ষেত্রে এত উন্নতি করেন যে, গভীর ইবাদতগুযার, খোদাভীরু, দিব্যদর্শন ও এলহামে অভিজ্ঞ বুযুর্গদের মাঝে গন্য হতেন। শেখ গোলাম আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি সংকল্প করি যে, আজকের রাত মসজিদ মোবারক-এ অতিবাহিত করব আর নির্জনে আমার প্রভুর কাছে যা ইচ্ছা হয় যাচনা করব। তিনি বলেন, মসজিদে পৌঁছে আমি দেখি যে, কোন ব্যক্তি সেজদারত রয়েছে আর কাতরচিত্তে দোয়া করছে। এমনকি তার অনুনয় বিনয়ের কারণে আমি নামাযও পড়তে পারি নি এবং আমার ওপর সেই ব্যক্তির দোয়ার প্রভাব ছেয়ে যায়। আর আমিও দোয়ায় মগ্ন হয়ে যাই। আমি দোয়া করি যে, হে প্রভু! এ ব্যক্তি তোমার কাছে যা কিছু যাচনা করছে তুমি তাকে তা প্রদান কর। আর আমি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে যাই যে, এই ব্যক্তি সেজদা থেকে মাথা উঠালে দেখবে যে, সে কে। তিনি বলেন, আমার জানা নেই যে, আমার আসার কত পূর্বে তিনি এসেছেন। কিন্তু তিনি যখন মাথা উঠান তখন দেখি যে, তিনি হযরত মিয়া মাহমুদ আহমদ সাহেব। আমি আসসালামু আলাইকুম বলি এবং করমর্দন করি আর জিজ্ঞেস করি যে, মিয়া! আজকে আল্লাহ্র কাছ থেকে কী কী চেয়ে নিয়েছ। তিনি বলেন, আমি তো এ যাচনাই করেছি যে, হে আমার প্রভু ! তুমি আমার চোখের সামনে ইসলামকে জীবিত করে দেখাও। আর এ কথা বলে তিনি ভিতরে চলে যান। ইসলামের বিজয়লগ্ন দেখার যে ব্যকুল বাসনাসেই স্বল্প বয়সে তার হৃদয়ে

বিরাজমান ছিল, তা সেই বয়সেই ফল বহন করা আরম্ভ করে,যখন আল্লাহ্ তা'লা যৌবনেই তাকে খিলাফতের পোশাক পরিধান করান। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব 'তাশহিযুল আযহান' পত্রিকায় তার এক দোয়ার কথা উল্লেখ করেন, যা তিনি ১৯০৯ সনে লিখেছেন। আমি আমার হৃদয়ের বেদনা প্রকাশের জন্য এই দোয়া এখানে লিপিবদ্ধ করছি। হয়ত কোন নেক প্রকৃতির মানুষ এতে উদ্বুদ্ধ হবে আর সে স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে নিজের জন্য এবং জামা'তের জন্য দোয়ায় রত হবে, যা আমার মূল উদ্দেশ্য। সেই দোয়াটি হলো-হে আমার মালিক, আমার সর্বশক্তিমান খোদা, আমার প্রিয় প্রভু, আমার পথের দিশারী, হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে জলবায়ুর নিয়ন্তা, হে সেই মহান ও গরিয়ান সত্তা, যিনি মহানবী (সা.) এর মতো অসাধারণ রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যিনি মহানবী (সা.) এর দাসদের মাঝে মসীহ্র মতো পথপ্রদর্শক সৃষ্টি করেছেন, হে নূরের স্রষ্টা, হে অন্ধকার বিমোচনকারী! তোমার দরবারে, হ্যাঁ, শুধু তোমারই দরবারে আমার মতো অসহায় বান্দা বিনত হয় এবং নিবেদন করে যে, আমার ডাকে সাড়া দাও এবং গ্রহণ কর, কেননা তোমার প্রতিশ্রুতিই আমাকে তোমার সামনে কিছু নিবেদন করার সাহস যুগিয়েছে। আমাকে তুমি শূন্য থেকে বানিয়েছ। আমাকেঅনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছ। আমার লালন পালনের জন্য চারটি মৌলিক উপাদান বানিয়েছ। আর আমার খবরাখবর রাখার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছ। যখন আমি আমার চাহিদার কথা বলতেও পারতাম না, তুমি আমার জন্য এমন মানুষ সৃষ্টি করেছ যারা নিজেরাই আমার জন্য চিন্তিত থাকত। এরপর আমাকে উন্নতি দিয়েছ আর আমার রিযককে বিস্তৃত করেছ। হে আমার প্রাণ, হ্যাঁ, হে আমার প্রাণ! তুমি আদমকে আমার পিতা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছ আর হওয়াকে আমার মা নিযুক্ত করেছ। আর স্বীয় দাসদের মধ্য থেকে এক দাসকে, যে তোমার সন্নিধানে সম্মানজনক মর্যাদা রাখতো, এজন্য নিযুক্ত করেছ যেন তিনি আমার মতো অবুঝ, নির্বোধ এবং স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির জন্য তোমার দরবারে সুপারিশ করেন আর আমার জন্য তোমার কৃপাকে আকর্ষণ করেন। আমি গুনাহগার ছিলাম, তুমি আমার পাপ ঢেকে রেখেছ। আমি ভ্রান্তিতে ছিলাম, তুমি আমার ভুলভ্রান্তি গোপন রেখেছ। প্রতিটি দুঃখ কষ্টে আমায় সঙ্গ দিয়েছ। যখনই আমি সমস্যা কবলিত হয়েছি, তুমি আমার সাহায্য করেছ। আর যখনই আমি ভ্রষ্টতার দ্বারপ্রান্তে ছিলাম, তুমি আমার হাত ধরেছ। আমার সব দুষ্কৃতি সত্ত্বেও তুমি তা উপেক্ষা করেছ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে তিনি বলেন যে, তোমার মতো স্নেহশীল কেউ হবে,এটি ধারণা ও কল্পনারও ঊর্ধ্বে। যখন আমি তোমার দরবারে এসে কাকুতিমিনতির সাথে আহাজারি করেছি, তুমি আমার ক্রন্দন শুনেছ এবং গ্রহণ করেছ। আমার ব্যাকুলচিত্তের দোয়া কখনো তুমি রদ করেছ বলে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। অতএব হে আমার খোদা! আমি অত্যন্ত বেদনার্ত হৃদয়ে এবং সত্যিকার উৎকণ্ঠা নিয়ে তোমার দরবারে বিনত হই এবং সেজদা করি আর নিবেদন করি যে, আমার দোয়া শুন এবং আমার ডাকে সাড়া দাও। হে আমার পবিত্র খোদা! আমার জাতি ধ্বংস হচ্ছে। তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর। যদি তারা আহমদী হওয়ার দাবি করে তাহলে যতক্ষণ তাদের হৃদয় ও বক্ষ পরিষ্কার না হবে তাদের সাথে আমার কিইবা সম্পর্ক। তোমার ভা লোবাসায় যদি তারা আপ্লুত না হয় তাহলে তাদের সাথে আমার কী কাজ। অতএব হে আমার প্রভু! তোমার রহিমিয়্যত ও রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে উচ্ছলিত কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর। সাহাবীদের মতো উদ্দীপনা আর উচ্ছ্বাস যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। তারা যেন তোমার ধর্মের জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। তাদের কর্ম যেন তাদের কথা থেকে অধিক উন্নত এবং স্বচ্ছ হয়। তারা যেন তোমার প্রিয় মুখের জন্য আত্মবিলীন করে এবং মহানবী (সা.) এর জন্য নিবেদিত হয়। তোমার মসীহ্র দোয়া তাদের পক্ষে গৃহীত হোক। তার পবিত্র এবং সত্য শিক্ষা তাদের অন্তঃকরণে ঠাই পাক। হে আমার খোদা! আমার জাতিকে সকল পরীক্ষা ও দুঃখ বেদনা থেকে রক্ষা কর এবং সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখ। তাদের মাঝে বড় বড় পুণ্যবান মানুষ সৃষ্টি কর। তারা এমন এক জাতিসত্তায় পরিণত হোক যারা তোমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হবে।আর তারা এমন এক জামা'তে পরিণত হোক যাদেরকে তুমি নিজের জন্য বিশেষভাবে বেঁছে নিবে। তারা শয়তানের আধিপত্য থেকে নিরাপদ থাকুক। আর সবসময় তাদের ওপর ফেরেশতা নাযেল হোক। এই জাতিকে ইহ ও পরকালে আশিসমণ্ডিত কর। আমীন, সুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

হুজুর বলেন, খিলাফত লাভের পূর্বে যখন তার বয়স কেবল ২০ বছর ছিল, তখনও তার হৃদয়ে ধর্ম এবং জাতির জন্য এক বেদনা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার আত্মার প্রতি সহস্র সহস্র রহমত বর্ষণ করুন। তিনি মহানবী (সা.) এর ধর্মের প্রসার এবং তাঁর নিষ্ঠাবান দাস মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য রাতদিন কাজ করে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করে আল্লাহ্র কাছে ফিরে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তার এই বেদনাভরা দোয়া বোঝার এবং আহ্মদীয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 22 February 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B